বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তী Bangladesh 50

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

ত্রৈমাসিক খাদ্যবার্তা

১ম বর্ষ • ১ম সংখ্যা • প্রকাশকাল: ডিসেম্বর ২০২১

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ
খাদ্য মন্ত্রণালয়
www.bfsa.gov.bd

‘আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে, উন্নত জীবনের অধিকারী হবে—এই হচ্ছে আমার স্বপ্ন।’

– জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

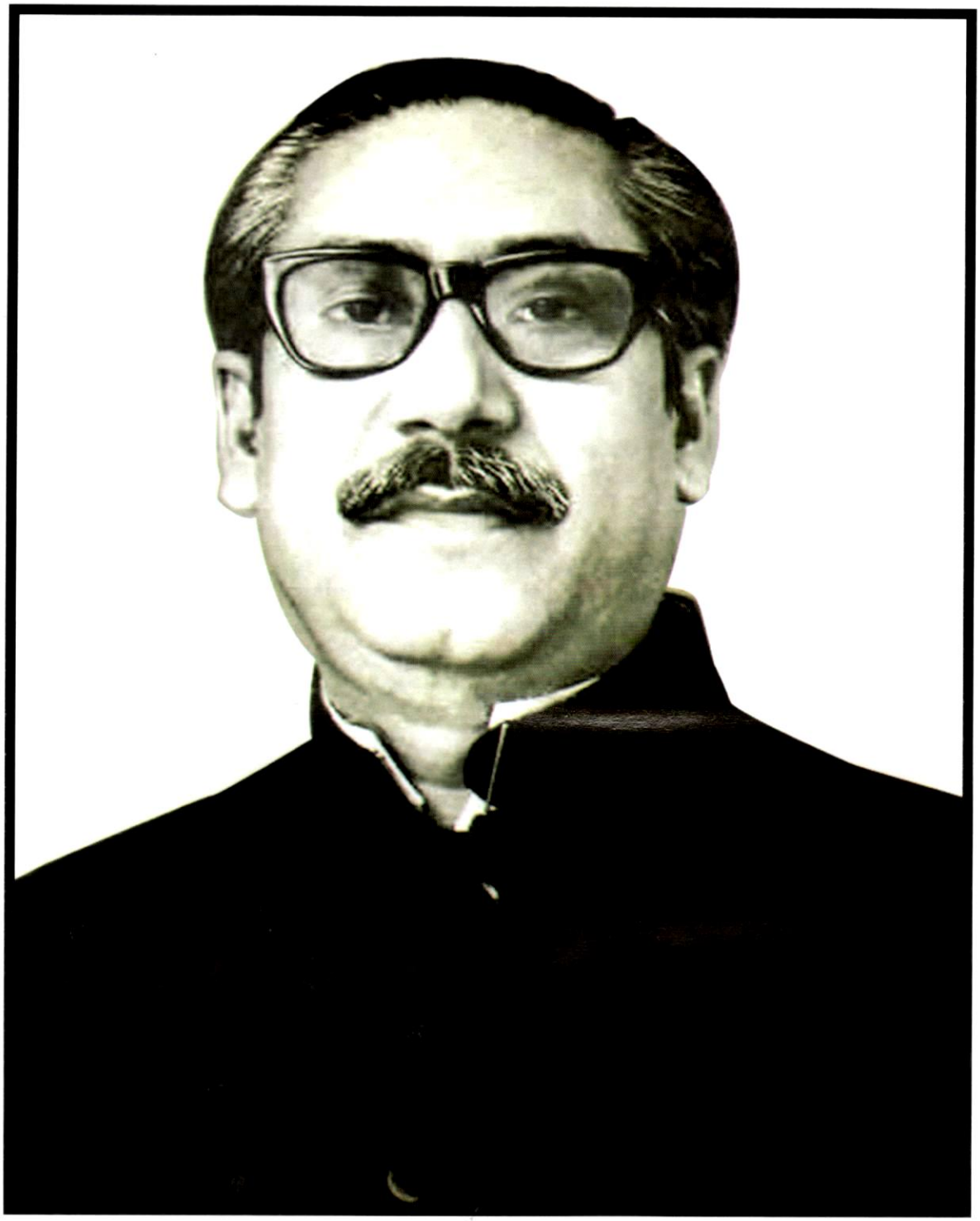

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

মুজিববর্ষ সংখ্যা

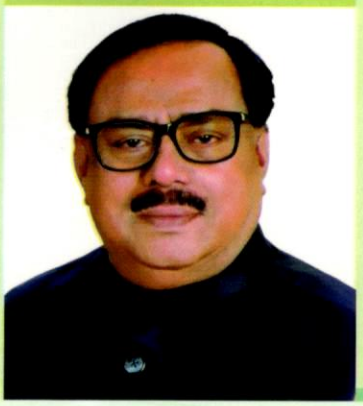

বাণী

মন্ত্রী
খাদ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর মাহেন্দ্রক্ষণে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কাজের স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা এবং নিরাপদ খাদ্য সম্পর্কিত তথ্যাবলী বিভিন্ন সংস্থা ও সর্বসাধারণের অবহতিকরণের লক্ষ্যে ত্রৈমাসিক ম্যাগাজিন 'খাদ্যবার্তা' প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

স্বাধীনতার মহান স্থপতি, শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর আজন্ম লালিত স্বপ্ন ছিল অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনের মাধ্যমে এ দেশের গণমানুষের কল্যাণ ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত করা। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও শোষণমুক্ত সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ার দর্শনকে বাস্তবে রূপ দেবার লক্ষ্যে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন। এই ধারাবাহিকতায় সমগ্র খাদ্য শৃঙ্খলের শুরু হতে ভোক্তার দোরগোড়া পর্যন্ত ভেজালমুক্ত নিরাপদ খাদ্যপ্রাপ্তি নিশ্চিত করতে বাংলাদেশের উন্নয়নের রূপকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্যোগে এবং তাঁর যুগোপযোগী বিচক্ষণ ও দূরদর্শী সিদ্ধান্তে প্রণীত হয় 'নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩'। এই আইন বাস্তবায়নে খাদ্যে পুষ্টিমান ও নিরাপদতা নিশ্চিতকল্পে সরকারের কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা হিসেবে ২০১৫ সালের ২ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করা হয়।

নিরাপদ খাদ্য আইনটি যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য পর্যায়ক্রমে বিধি, প্রবিধি, গাইডলাইন প্রণয়ন, ভেজাল রোধে বিভিন্ন জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা, ল্যাবরেটরি ভ্যান চালুসহ বিভিন্ন প্রকার ক্ষতিকর খাদ্য উপাদান আমদানি, মজুদ, পরিবহন ও বিক্রয় বন্ধের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। নিরাপদ খাদ্য অফিসারগণ স্ব স্ব জেলা প্রশাসকগণের সাথে সমন্বয় করে এবং সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাবৃন্দের সাথে যোগাযোগ রক্ষার মাধ্যমে কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম সম্প্রসারণের নিমিত্ত প্রতিনিয়ত কাজ করে চলেছেন। বর্তমানে দেশের ৬৪ জেলায় নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের পদচারণা প্রতীয়মান।

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের হটলাইন সেবা ৩৩৩ চালু; রাজধানীর ১২৪ টি হোটেল-রেস্তোরাঁ, মিষ্টির দোকান ও বেকারী কে খাদ্যের নিরাপদতা অনুসারে A+, A, B ও C ক্যাটাগরিতে গ্রেডিং করে কঠোর মনিটরিং এর আওতায় আনা হয়েছে। 'নজর' অ্যাপস ব্যবহার করে মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদারের উদ্ভাবনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

ত্রৈমাসিক ম্যাগাজিন প্রকাশের মাধ্যমে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ নিরাপদ খাদ্য ও পুষ্টি নিয়ে আগ্রহী সর্বস্তরের জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতাবোধ ও আগ্রহ সৃষ্টি করা এবং কর্তৃপক্ষের নিজেদের কর্মউদ্দীপনা ও প্রাণশক্তি আরও দৃঢ় হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আমি উদ্যোগটির সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

সাধন চন্দ্র মজুমদার, এমপি

মুজিববর্ষ সংখ্যা

বাণী

সভাপতি
খাদ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত
সংসদীয় স্থায়ী কমিটি
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের ত্রৈমাসিক ম্যাগাজিন 'খাদ্যবার্তা' এর 'মুজিববর্ষ' সংখ্যা প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। বিজয়ের মাসে নিরাপদ খাদ্য সংক্রান্ত সরকারের গৃহীত সুদৃঢ় পদক্ষেপ, স্বর্ণালী অর্জন ও জনসচেতনতামূলক বিভিন্ন বার্তার সম্ভার এই ম্যাগাজিন প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মস্তিষ্কপ্রসূত অভূতপূর্ব প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ। খাদ্য নিরাপদতা নিশ্চিতকরণের সর্বোচ্চ সমন্বয়কারী ও নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠানটি ২০১৫ সালে যাত্রা শুরুর পর থেকে বাংলাদেশে নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে আসছে। নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ ও এর যথাযথ বাস্তবায়নে প্রণীত বিধি, প্রবিধি ও গাইডলাইনের যথোপযুক্ত প্রয়োগের মাধ্যমে দেশে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ে গণজাগরণ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। খাদ্যশিল্প, রেস্তোরাঁ, বাজার ও অন্যান্য খাদ্যস্থাপনা পরিদর্শন ও নিয়মিত মনিটরিং, বিভাগীয় শহর থেকে শুরু করে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক বিজ্ঞানভিত্তিক, যুগোপযোগী ও সহজবোধ্য প্রচারণামূলক কার্যক্রম যেমন: সেমিনার, উঠান বৈঠক, ক্যারাভান রোড শো, টিভিসি সম্প্রচার, সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচার প্রচারণা ও নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক কুইজ প্রতিযোগিতা আয়োজন, ঝুঁকিপূর্ণ খাদ্যনমুনা পরীক্ষণ, মোবাইল কোর্ট ও খাদ্য আদালতে বিচারিক কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য আইন ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ ইত্যাদি বহুমাত্রিক কার্যক্রম জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিতে অগ্রণী ভূমিকা রাখছে।

দেশের সর্বস্তরের জনগণের জন্য সুন্দর জীবন ও সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গৃহীত নানাবিধ পদক্ষেপ সম্পর্কে সম্যক অবহিত হবার মাধ্যমে জনগণের মাঝে আস্থার সৃষ্টি হবে, মানুষের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পাবে, পাশাপাশি সচেতন একটি জনগোষ্ঠী তৈরি হবে, যা ভবিষ্যতে উন্নত সুখী ও সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে। এ প্রেক্ষাপটে খাদ্য উৎপাদন থেকে শুরু করে ভোক্তা পর্যন্ত সকল স্তরে খাদ্য নিরাপদ রেখে সুষম ও পুষ্টিকর খাদ্য নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত বলিষ্ঠ পদক্ষেপসমূহ জনসাধারণের নিকট 'খাদ্যবার্তা' ম্যাগাজিনটি সফলভাবে উপস্থাপন করতে পারবে, এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

পরিশেষে, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি সশ্রদ্ধ সালাম জ্ঞাপনপূর্বক আমি 'খাদ্যবার্তা' ম্যাগাজিনের 'মুজিববর্ষ' সংখ্যার সার্বিক সাফল্য ও সার্থকতা কামনা করছি।

দীপংকর তালুকদার, এমপি

মুজিববর্ষ সংখ্যা

বাণী

সচিব
খাদ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে 'মুজিববর্ষ'কে সামনে রেখে প্রথমবারের মতো নিরাপদ খাদ্য সংশ্লিষ্ট ত্রৈমাসিক ম্যাগাজিন 'খাদ্যবার্তা' প্রকাশ করা হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা বিনির্মাণের অন্যতম হাতিয়ার হচ্ছে সুস্থ ও কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী। আর সুস্বাস্থ্যের গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হচ্ছে পর্যাপ্ত পুষ্টিকর ও নিরাপদ খাদ্য গ্রহণ। পুষ্টিকর নিরাপদ খাদ্যপ্রাপ্তি জনগণের সাংবিধানিক অধিকার। জনগণের সে সাংবিধানিক অধিকার পূরণের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্ব ও সঠিক দিক নির্দেশনার আলোকে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ দেশের জনসাধারণের নিরাপদ খাদ্যপ্রাপ্তি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। খাদ্যের নিরাপদতার মান নিয়ন্ত্রণে একটি কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী সংস্থা হিসেবে সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি-বেসরকারি অংশীজনের মধ্যে সুষ্ঠু সমন্বয়ের মাধ্যমে সংস্থাটি খাদ্যে ভেজালরোধে সচেতনতামূলক প্রচারণাসহ ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা, খাদ্যের নিরাপদতা ও গুণগতমান পরীক্ষণ, নিরাপদতার মান অনুসারে রেস্তোরাঁর গ্রেডিং প্রদান ও নিয়মিত মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে। নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য পর্যায়ক্রমে বিধি, প্রবিধি, গাইডলাইন, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো প্রণয়নসহ আনুষঙ্গিক কার্যক্রমের মাধ্যমে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের উদ্যোগসমূহ ক্রমেই জাতির কাছে দৃশ্যমান হচ্ছে।

খাদ্য উৎপাদন থেকে শুরু করে খাদ্য গ্রহণ পর্যন্ত প্রতিটি স্তর তথা উৎপাদন, আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, সরবরাহ ও বিপণন পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট সকলের মধ্যে খাদ্যের পুষ্টিমান ও নিরাপদতার গুরুত্ব পৌঁছে দেওয়া আবশ্যক। এ লক্ষ্যে সকল অংশীজনসহ সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। দীর্ঘমেয়াদে একটি সুস্থ-সবল জাতি গঠনে এর কোন বিকল্প নেই। এ প্রেক্ষাপটে পুষ্টিকর ও নিরাপদ খাদ্যপ্রাপ্তি নিশ্চিতকরণে জনসচেতনতা সৃষ্টি ও সরকারের গৃহীত উদ্যোগসমূহ জনসাধারণের মাঝে ছড়িয়ে দিতে 'খাদ্যবার্তা' উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

আমি এ ম্যাগাজিন প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

ড. মোছাম্মৎ নাজমানারা খানুম

মুজিববর্ষ সংখ্যা

মুখবন্ধ

চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ
খাদ্য মন্ত্রণালয়

নিরাপদ খাদ্যপ্রাপ্তি জনগণের সাংবিধানিক অধিকার। একটি কর্মক্ষম, দক্ষ ও সৃজনশীল জাতি গঠনের পূর্বশর্তই হল পুষ্টিমানসমৃদ্ধ নিরাপদ খাদ্য; যা নিশ্চিত করতে সরকার বদ্ধপরিকর।

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান-এঁর স্বপ্ন ছিলো ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ার। সেই লালিত স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করার লক্ষ্যে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্যোগে এবং যুগোপযোগী বিচক্ষণ ও দূরদর্শী সিদ্ধান্তে প্রণীত হয় 'নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩'। এই আইন বাস্তবায়নে ০২ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ সালে 'জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় সকলের জন্য নিরাপদ খাদ্য' প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ।

দেশের সকল জেলায় বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের আঞ্চলিক কার্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে ৬৪ জন নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা পদায়ন করে জেলা পর্যায়ে জনসচেতনতা, মনিটরিং ব্যবস্থা ও এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। 'নিরাপদ খাদ্য আইন-২০১৩' সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় ৩টি বিধি ও ৮টি প্রবিধি প্রণয়ন করা হয়েছে। খাদ্যের নিরাপদতা নিশ্চিতকরণের জন্য আইনানুগ অভিযান পরিচালনার পাশাপাশি জনসচেতনতা সৃষ্টিকল্পে সারাদেশে কর্মশালা, সেমিনার, ক্যারাভান রোড শো, পাবলিক মিটিং আয়োজন, ভিডিও প্রদর্শনী, মাইকিং, লিফলেট, গণবিজ্ঞপ্তি, উঠান বৈঠক, বাল্ক মেসেজ, টিভি স্ক্রল, প্যাম্পলেট, পোস্টার ও স্টিকার বিতরণ, বিভিন্ন স্কুলে হাত ধোয়াসহ বিভিন্ন প্রচারণামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। বিভিন্ন বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে টিভিসি নির্মাণপূর্বক বিভিন্ন টিভি-চ্যানেলে প্রচার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

এছাড়াও, খাদ্যের ভেজাল সম্পর্কে অভিযোগ প্রাপ্তি ও তাৎক্ষণিক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্তে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের হটলাইন সেবা ৩৩৩ চালু করা হয়েছে। খাদ্য ও সেবার মান বৃদ্ধি এবং জনগণকে সচেতন করার লক্ষ্যে ঢাকাসহ সারাদেশে ১২৪টি হোটেল-রেস্তোরাঁ, মিষ্টি দোকান ও বেকারী কে A+, A, B ও C ক্যাটাগরিতে কঠোর মনিটরিং এর মাধ্যমে গ্রেডিং প্রদান করে করা হয়েছে। ৫টি খাদ্য প্রতিষ্ঠানের ৮টি আউটলেটে "নজর এ্যাপ" ব্যবহার করে ডিজিটাল মনিটরিং করা হচ্ছে। খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণে তাপমাত্রা ব্যবস্থা সঠিকভাবে পর্যবেক্ষণের জন্য ৩টি মেগাশপের ৬টি আউললেটে টেম্পারেচার ডাটালগার স্থাপন করা হয়েছে। মুজিববর্ষের কর্মসূচি হিসেবে ১০০টি খাদ্যস্থাপনা পরিদর্শন সংক্রান্ত Safe Food Plan ইতোমধ্যে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এছাড়া জাপান সরকারের অনুদানে ঢাকায় একটি আন্তর্জাতিক মানের Food Testing Laboratory স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

জনসাধারণকে সচেতন ও নিরাপদ খাদ্য সম্পর্কিত সঠিক ধারণা প্রদান করার লক্ষ্যে ১৬ই ডিসেম্বর, ২০২১ মহান বিজয় দিবসে প্রথমবারের মত বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের ত্রৈমাসিক প্রকাশনা 'খাদ্যবার্তা'-এর মুজিববর্ষ সংখ্যা প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে এই সংখ্যায় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নিরাপদ খাদ্যসংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ নিবন্ধ ও লেখনী অন্তর্ভুক্ত হতে যাচ্ছে। আমি আশা করছি, এই প্রকাশনা বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম এবং খাদ্যের নিরাপদতা সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে স্বচ্ছ ধারণা তৈরি করবে।

প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাই।

মো. আব্দুল কাইউম সরকার

মুজিববর্ষ সংখ্যা

মেদভুড়ি : ওজনের বোঝা!

ডা. এ বি এম আব্দুল্লাহ
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত চিকিৎসক

সুস্বাস্থ্য সবারই কাম্য, সাথে সুন্দর চেহারাটাও। মোটা হলে গোলগাল, নাদুসনুদুস দেখা যায়, অনেকের কাছেই বেশ ভালো লাগে। আবার বেশি মোটা সুশ্রীও দেখায় না, বিশেষ করে অনেক মেয়েরা তো একদম পছন্দই করে না। ভালো কী মন্দ দেখায়, তার চেয়েও জরুরি মোটা হলে স্বাস্থ্যের কোনো সমস্যা হয় কিনা। আসল সত্য হলো, মোটা বা অতিরিক্ত ওজন স্বাস্থের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। দিন দিন মুটিয়ে যাওয়া কারোরই কাম্য নয়, বাড়তি ওজন মানেই বাড়তি বোঝা। স্বাস্থ্যটা যদি শরীরের উচ্চতার মাত্রা ছাড়িয়ে যায়, তখন নিজের সৌন্দর্য বলতে কিছুই থাকে না। মেদবিহীন ছিপছিপে গড়ন শুধু সৌন্দর্য বাড়ায় না, জীবনযাপনও সহজ করে। যাদের ওজন বেশি, মেদ মাংসে দেহ যাদের স্থূল, জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে তাদের ভোগান্তি বা বিড়ম্বনার সম্মুখীন হতে হয়। মানসিক এবং শরীরের বিভিন্ন রোগসহ দৈনন্দিন কাজেও সৃষ্টি হয় নানা রকম ব্যাঘাত। অল্প পরিশ্রমেই হয় পরিশ্রান্ত। মোটা মানুষ আয়নার সামনে দাঁড়ালে নিজেকেই দেখে রীতিমতো হিমশিম খায়। কোনো কাজ সহজভাবে করা কঠিন হয়, সব জায়গাতেই শরীরটা সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। মানসিক এবং শারীরিক সবদিক দিয়েই একটি বাড়তি টেনশন। দেখা যায়, ভুক্তভোগী প্রায়ই ডিপ্রেশনে ভোগেন। মোটা মানুষ দেখলে অনেকেই তার দিকে কৌতূকপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকায়, মনে মনে হয়তো বলে, "হায়রে কত মোটা, না জানি কত খায়"। সামাজিক কোনো অনুষ্ঠানে গেলেও অনেকেই তার দিকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকায়। কোথাও প্রবেশ পথ যদি অপ্রশস্ত হয়, তবে সেখানে ঢোকাও বেশ কষ্টকর হয়। এমনকি পরিবহন যেমন বাস, ট্রেনে ভীড়ের মধ্যে ঠেলে ওঠাও কঠিন হয়। লিফটে সাধারণত কত জন লোক ওঠা যাবে, তা লেখা থাকে। কিন্তু একজন মোটা মানুষ লিফটে উঠলেই বাকিরা টিপ্পনি কাটে, হাসতে হাসতে বলতে থাকে, "একজনই তো পাঁচজনের জায়গা দখল করে ফেললো।" কোনো কোনো সভাস্থলে ফোল্ডিং চেয়ার থাকে, সেখানে বসতে গিয়ে বিড়ম্বনার শিকার হওয়া অস্বাভাবিক নয়, এমনকি ছোট্ট চেয়ারখানা ভেঙ্গেও পড়তে পারে! পাশের লোকেরা হাসাহাসি করে ঘটনাটি উপভোগ করেন, কিন্তু মোটা মানুষটির জন্য তা হয় অস্বস্থিকর, বিব্রতকর এবং লজ্জাকর। মোটা যাত্রীকে রিকসাওয়ালাও নিতে চায় না, যদি সাথে দ্বিতীয় আরেকজন সহযাত্রী থাকে। আবার জনপরিবহনে একাই দুই তিন জনের জায়গা দখল করে বসতে হয়, ফলে অন্যেরও অসুবিধার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। মোটকথা, স্থূল দেহ নিয়ে কোথাও বের হলেই সবার দৃষ্টি আকর্ষণ তো হবেই, আর বিব্রতবোধসহ বিপর্যয় হবেই।

মেদ বা স্থূলতার সাথে অনেক রোগের সম্পৃক্ততা। অর্থাৎ বেশি ওজন যাদের, রোগব্যাধি তাদের। অজ্ঞাতসারে আর অজান্তে বিভিন্ন ধরণের রোগগুলো শরীরে দানা বাঁধবেই। নিম্নে কিছু উদাহরণ দেওয়া হলো, যেগুলো ওজনের সাথে সম্পৃক্ত :

- ডায়াবেটিস বা বহুমূত্র সাধারণ লোকের তুলনায় বেশি হয়। আবার ডায়াবেটিস রোগে আক্রান্ত হয়ে গেলে, তার সাথে ডায়াবেটিসজনিত জটিলতাগুলোও বেশি মাত্রায় দেখা দেয়।
- শরীরে অতিরিক্ত চর্বি বা ডিজলিপিডিমিয়া প্রায়ই দেখা দেয় এবং রক্তে কোলেস্টারল, ট্রাইগ্লিসারাইড ইত্যাদি বৃদ্ধি পায়। রক্তনালীর দেয়ালে অতিরিক্ত চর্বি জমা হওয়ার কারণে হার্ট ডিজিজ, উচ্চ রক্তচাপ সাধারণ লোকের তুলনায় বেশি হয়। এমনকি ব্রেন স্ট্রোকে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি থাকে। রক্তনালীতে থ্রম্বোসিস হয়ে তা বন্ধ হয় এবং বিভিন্ন জটিল রোগ হতে পারে। যেমন– হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, মাথার রক্তনালী বন্ধ হয়ে মৃত্যুও ঘটতে পারে।
- অস্টিওআর্থাইটিস ও গেটে বাত : শরীরের ওজন বহন করার মাধ্যম হচ্ছে অস্থিসন্ধি। অতিরিক্ত ওজন বহন করার জন্য অস্থিসন্ধিতে পরিবর্তন দেখা দেয়। জয়েন্ট বা অস্থির সংযোগস্থলে অধিক ওজনের ফলে নতুন অস্থি তৈরি হয়, আকারে পরিবর্তন হয়ে 'অস্টিওআর্থাইটিস' নামক রোগটি দেখা দেয়। সাধারণ লোকের তুলনায় স্থূল ব্যক্তির হাড় ক্ষয় বেশি হয়। জয়েন্টে ফ্লুয়িড জমে যেতে পারে, পরবর্তী সময়ে অস্থিসন্ধি স্টিফ হয়ে যায়। মেরুদণ্ড, কোমর এবং হাঁটুতে ব্যথা বা প্রদাহ বেশি মাত্রায় দেখা দেয়। এক পর্যায়ে চলাফেরা আরও কঠিন হয়ে যায়। এছাড়াও, রক্তের ইউরিক এসিড বেড়ে অন্য একটি বাতরোগ হয়, যাকে বলে গেটে বাত।

- অধিক চর্বি জমা হওয়ার ফলে পেটের ও পায়ের মাংসপেশীর সংকোচন ও সম্প্রসারণ বাধাগ্রস্থ হয়। ফলে হার্নিয়া হতে পারে এবং পায়ের শিরায় ভেরোকোসিটি দেখা দেয়।
- সাধারণ লোকদের তুলনায় বিশেষত চল্লিশ উর্ধ্ব মহিলাদের পিত্তথলির পাথর বেশি মাত্রায় হয়ে থাকে।
- লিভারের কোষে চর্বি জমা হওয়ার কারণে ফ্যাটি লিভার হয়। ফলে লিভারের বিভিন্ন জটিলতা এমনকি সিরোসিস জাতীয় রোগে আক্রান্ত হবার ঝুঁকি থাকে।
- ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা বেশি হয়। খাদ্যনালী, কোলন, লিভার ক্যান্সার এবং লিম্ফনোডের ক্যান্সার থেকে মৃত্যুঝুঁকি স্থূল লোকদের বেশি।
- নাক ডাকা, স্লিপ এপনিয়া সিনড্রোম জাতীয় রোগ বেশি হয়। শ্বাসপ্রশ্বাসের অসুবিধা, দিন এবং রাত উভয় সময়েই বেশি ঘুম, ঘুমের মধ্যে নাক ডাকা, মুখ হা করে শ্বাস-প্রশ্বাস, পলিসাইথিমিয়া এবং শেষ পর্যন্ত ডানদিকের হার্ট ফেইলিউর মোটা লোকদের বেশি হয়।
- বন্ধ্যাত্বঃ স্থূলতার কারণে অনেক সময় সন্তান ধারণে সমস্যা হয়। স্থূল কিশোরী ও তরুণীদের ডিম্বাশয়ে সিস্ট ও অনিয়মিত মাসিক থেকে শুরু করে বন্ধ্যাত্ব, শরীরে জরায়ুতে সিস্ট ও উর্বরতা হ্রাসের কারণ হিসেবে স্থূলতা দায়ী। এ ছাড়া স্তন ক্যানসার ও ডিম্বাশয় ক্যানসারের ঝুঁকির সঙ্গেও স্থূলতার সম্পর্ক রয়েছে।
- ত্বকের নানা সমস্যাঃ ত্বকের রং কালো হয়ে যাওয়া বা অ্যাকানথোসিস নাইগ্রিক্যানস, ত্বকের কুঁচকিতে সংক্রমণ, যেমন ক্যানডিডা সংক্রমণ এবং লসিকা নালিতে পানি জমা এসব স্থূল শরীরের ব্যক্তিদেরই সমস্যা। এমনকি অবাঞ্ছিত লোম ইত্যাদি সমস্যা হতে পারে।
- মানসিক সমস্যা : স্থূলতার সঙ্গে মানসিক সমস্যা যেমন বিষণ্নতা, আত্মবিশ্বাসের অভাব বা সামাজিকভাবে হেয় হওয়া ইত্যাদি স্থূলতার সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত।

মোটা বা স্থূলতার কারণ :

- সাধারণত জেনেটিক বা বংশগত কারণই মোটা হওয়ার অন্যতম কারণ। যেমন মা-বাবা এবং পরিবারের অন্যান্যরা যদি স্থূল বা মোটা হয়ে থাকেন।
- অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণ মোটা হওয়া বা ওজন বাড়ার অন্যতম কারণ। মনে রাখতে হবে, অতি ভোজনই অতি ওজন। অনেকেই বলে থাকেন অমুকের সাথে একই খাদ্য খাই, এমনকি আমি ততবেশি খাই না, অথচ তার ওজন বাড়ে না, আমার কেন বাড়ে? প্রশ্নটা যৌক্তিক। কিন্তু মনে রাখতে হবে, ওজন বাড়াটা শুধু খাওয়ার ওপর নির্ভর করে না। এটা জমা খরচের মতো। সারাদিন কাজকর্ম বা পরিশ্রম করে কতটুকু শক্তি ক্ষয় হলো, সেটার ওপরও নির্ভর করে। অর্থাৎ খাবারের মধ্যে যা শক্তি সঞ্চয় হয়, কায়িক পরিশ্রম বা ব্যায়ামের মাধ্যমে ক্ষয় না হলে, ওজন বাড়তেই থাকবে। মোটকথা, অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণের মাধ্যমে শরীরে যা জমা হয়, শ্রমের মাধ্যমে তা ব্যয় না করলেই মোটা বা স্থূলতার ঝুঁকি থেকেই যাবে।
- উন্নত জীবনযাত্রা ও পরিশ্রমবিহীন অলস জীবনযাপনও মোটা হওয়ার অন্যতম কারণ।
- অ্যালকোহল, এনার্জি ও হেলথ ড্রিংকস, কোমল পানীয়, ফাস্টফুড ইত্যাদি ফ্যাশনেবল পানীয় মোটা হওয়ার ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়।
- অ্যান্ড্রোক্রাইন ও হরমোনজনিত রোগ, যেমন হাইপোথাইরোইডিজম, কুশিংছ সিনড্রোম ইত্যাদি।
- দীর্ঘদিন যাবত কিছু কিছু ঔষধ ব্যবহারের ফলে মোটা হওয়ার প্রবণতা থাকে। যেমন–স্টেরোয়েড জাতীয় ঔষধ।

যেহেতু শরীরের বাড়তি ওজন কারোই কাম্য নয়, সবাই চায় বাড়তি মেদহীন সুঠাম দেহ এবং সুন্দর স্বাস্থ্য, তাই শরীরের বাড়তি মেদের সমস্যায় যারা ভুগছেন, তাদের এ বিষয়ে অনেক কিছু করণীয় আছে। অবশ্যই ওজন কমানোর যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রথমেই মনে রাখতে হবে, দ্রুত বা তাড়াহুড়ো করে ওজন কমানো সম্ভব নয়। নিয়ম মাফিক ধৈর্য্য সহকারে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। শুরুতেই ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রয়োজন হতে পারে। শারীরিক কোনো রোগ সনাক্ত করা গেলে, সে অনুযায়ী চিকিৎসা চালিয়ে যেতে হবে। এছাড়া ওজন কমানোর অন্যান্য পদ্ধতিগুলো আপনার নিজের হাতের মুঠোতেই। মনে রাখতে হবে, ওজন নিয়ন্ত্রণের মূল চাবিকাঠি

খাওয়া দাওয়া এবং কায়িক পরিশ্রমের সঙ্গে জড়িত। প্রয়োজনের তুলনায় অধিক ভোজন এবং তার ফলেই দেহের অধিক ওজন। পেটটা অতিরিক্ত খেয়ে ভর্তি না করাই শ্রেয়, বরং পেটের কিছুটা অংশ খালি রাখা ভালো। ধর্মীয় দৃষ্টিতেও এর সমর্থন পাওয়া যায় এবং তা বিজ্ঞানভিত্তিক। পেটের এক অংশ পূর্ণ হবে খাদ্যে, এক অংশ পূর্ণ হবে পানিতে এবং এক অংশ থাকবে খালি। মনে রাখতে হবে, নিয়মিত খাবার এবং শারীরিক পরিশ্রম, এই দুইয়ের সামঞ্জস্য থাকা খুবই জরুরি। নিচে কিছু টিপস দেয়া হলো :

- ওজন সীমিত রাখতে পরিমিত খাবার খেতে হবে। খাদ্যাভাস পরিবর্তন করে সুষম খাদ্য যাতে পরিমাণ মতো কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন এবং কম চর্বি থাকে।
- অধিক ক্যালরিযুক্ত খাবারের পরিবর্তে কম ক্যালরিযুক্ত খাবার গ্রহণ করতে হবে। যেমন - ফলমূল, শাক-সবজি ও তরিতরকারী বেশি বেশি খাওয়া ভালো, তাতে চর্বি ও শর্করামুক্ত খাবার কম খাওয়া হবে। প্রোটিনের চাহিদাও মিটবে।
- ফাস্টফুড জাতীয় খাদ্য এবং বাইরের খাবার পরিহার করে ঘরের তৈরি স্বাস্থ্যসম্মত খাবার খাওয়া ভালো, তবে ভাত কম খাওয়াই উচিত।
- ঘি, মাখন, অতিরিক্ত চিনি মিশ্রিত চা, কফি, চর্বি জাতীয় খাদ্যদ্রব্য পরিহার করতে হবে।
- খাদ্য তালিকায় আঁশযুক্ত খাবার, ভিটামিন, মিনারেল এবং এন্টিঅক্সিডেন্ট যেন থাকে।
- চিনি, মিষ্টি জাতীয় খাবার পরিহার করুণ। রাস্তায় বের হলে অলিতে গলিতে রকমারি মিষ্টির দোকানে ভর্তি। বাড়িতে মেহমান আপ্যায়নের অন্যতম উপাদান মিষ্টি। যেকোনো উৎসবে যেমন সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে, সন্তানের সুন্নতে খৎনা করালে, পদোন্নতি পেলে, পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট হলে, নতুন চাকুরী পেলে, বিবাহ উৎসবে মিষ্টির ছড়াছড়ি। তাই নিজের জিহ্বাকে সংযত রাখতে সচেষ্ট হতে হবে।
- বাইরের তৈরি জুস, কোল্ড ড্রিংকস, হেলথ ড্রিংকস, এনার্জি ড্রিংকস, সফট ড্রিংকস পরিহার করা উচিত।
- প্রচুর পানি পান করুন। খাওয়ার আগে বেশি পানি খেয়ে নিলে, খাওয়ার পরিমাণটা কম লাগবে।
- বিভিন্ন উৎসবে বিশেষ খাবার থাকবেই যেমন পোলাও, বিরিয়ানি এবং অন্যান্য গুরুপাক জাতীয় খাদ্য। আপনার ওজন যেন না বাড়ে, এটা মাথায় রেখেই পরিমাণ মতো খেতে হবে। এতে অতি ভোজের সম্ভাবনা কিছুটা হলেও কমবে।
- এছাড়াও খাওয়ার আগে শসা, টমেটো, পেয়ারা খেয়ে নিলেও ভাতের পরিমাণ কম লাগবে।
- বাড়তি চর্বি পোড়ানোর জন্য প্রতিদিন পরিশ্রম করতে হবে। নিয়মিত হাঁটা-চলা, লিফটে না চড়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠা, অল্প দূরত্বে গাড়ি বা রিকসা পরিহার করে হেঁটে চলার অভ্যাস করতে হবে। এগুলো শরীরের মেদ ঝরাতে সাহায্য করে।
- ওজন কমাতে রীতিমতো কাজকর্ম, শারীরিক পরিশ্রম এবং ব্যায়াম করতেই হবে। যে ধরণের ব্যায়াম একজন মানুষের জন্য সহজ এবং সহ্য ক্ষমতার মধ্যে, ততটুকু করলেও চলবে। সম্ভব হলে ফ্রি হ্যান্ড ব্যয়াম, সাঁতার কাটা, সাইক্লিং, জগিং ইত্যাদি অভ্যাস করা ভালো। সুযোগ থাকলে ওজন কমানোর জন্য জিমেও যাওয়া যায়।
- গর্ভকালে অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ডায়েট কন্ট্রোল করা উচিত।

অনেকে মেদ কমাতে গিয়ে খাওয়া একেবারেই কমিয়ে দেন, এমনকি খাওয়া দাওয়া একেবারেই ছেড়ে দেন, যা মোটেই কাম্য নয়। মনে রাখতে হবে, ডায়েট কন্ট্রোল করা মানে খাওয়া দাওয়া বন্ধ করা নয়। এতে প্রয়োজনীয় শক্তির অভাবে শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে। তাই ঢালাওভাবে সব খাবার না কমিয়ে প্রথমে তেল ও চর্বিযুক্ত খাবার কমান, এরপর ধীরে ধীরে অন্যান্য খাবার কমাবেন। অবশ্যই নির্দিষ্ট মাত্রায়। এছাড়া অভিজ্ঞ ডাক্তারের এবং একজন পুষ্টিবিদের পরামর্শ নেয়া উচিত। ওজন কমানোর কার্যকরী তেমন কোনো ঔষধ নাই। বাজারে যেগুলো পাওয়া যায়, সেগুলোও তেমন কোনো সুফল বয়ে আনে না। বরং এগুলো ব্যবহারের ফলে অনেক ক্ষেত্রে অর্থের অপচয় তো ঘটেই, শারীরিক ক্ষতিও হতে পারে। ওজন নিয়ন্ত্রণে আনা কোন কঠিন কাজই নয়। স্বাস্থ্যসম্মত খাবার এবং নিয়মতান্ত্রিক সুশৃঙ্খল জীবন যাপনে অভ্যস্ত হলেই ওজন নিয়ন্ত্রণ অবশ্যই সম্ভব। মনে রাখতে হবে, সুস্থ থাকার চাবিকাঠি আপনার নিজের হাতেই। একটি প্রবাদ দিয়ে শেষ করছি :

"মেদ মাংস বেড়ে যায়, দেহ স্থূল হয়,
শ্রম সাধ্য কর্মে তার ধ্রুব পরাজয়।"

মুজিববর্ষ সংখ্যা

বঙ্গবন্ধুর দেশভাবনা এবং আমাদের কর্তব্য

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম
সাবেক অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

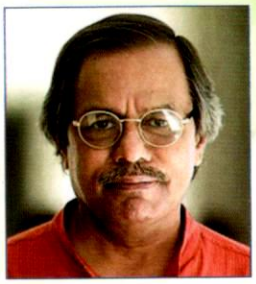

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রাজনীতিতে সক্রিয় হন স্কুলের ছাত্র থাকার সময়, যেহেতু তিনি গ্রামীণ জীবনের দু:খ-দুর্দশা, বঞ্চনা-হতাশার ছবিগুলি খুব কাছ থেকে দেখেছেন। তিনি প্রতিবাদী মানুষ ছিলেন, মাটি ও মানুষের প্রতি তাঁর ভালবাসা ছিল। কাজেই রাজনীতির মাধ্যমে মাটি ও মানুষের জন্য তিনি তাঁর সংগ্রাম চালিয়ে যাবেন, এই প্রত্যয় থেকে সেই ১৬-১৭ বছর বয়স থেকেই তিনি নানা শক্তিধর প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে নেমেছিলেন। সময়টা ছিল বৃটিশ উপনিবেশবাদের। উপনিবেশী শাসনে মানুষের অধিকার হয় ভুলুণ্ঠিক, জীবন হয়ে দাঁড়ায় অবরুদ্ধ। সেই অবরুদ্ধতার অবসান ঘটানোই ছিল বঙ্গবন্ধুর উদ্দেশ্য।

অবিভক্ত ভারতে তখন চলছে দেশভাগের প্রবল সংগ্রাম। পূর্ববাংলার ভাগ্য তখন পাকিস্তানের সঙ্গে বাঁধা। সকলেরই মনে হচ্ছিল, পাকিস্তান আমাদের সব সমস্যার সমাধান করে দিবে। কিন্তু পাকিস্তানি শাসনের নিচে গিয়ে বুঝা গেল, এক উপনিবেশিকতা থেকে বেরিয়ে আরেক নব্য উপনিবেশী নিগড়ে আমরা বাঁধা পড়েছি। সেই অধিকারহীনতা, সেই শোষণ বঞ্চনা, সেই জাতিসত্তা থেকে নিয়ে সংস্কৃতি – সবকিছুকে অস্বীকার করে শাসকগোষ্ঠির অধীনস্থ করা।

শুরু হল বাংলা ভাষাকে অবদমিত, মর্যাদাহীন করে রাখার বিরুদ্ধে সর্বাত্মক সংগ্রাম। বঙ্গবন্ধু সেই সংগ্রামে থাকলেন সামনের কাতারে। এর আগে নতুন উপনিবেশী শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে রাস্তায় নামলে তাঁকে কারাগারে বন্দী করা হয়েছিল। কারাগারে থেকেই তিনি যুক্ত হয়েছিলেন ভাষা আন্দোলনে।

ভাষা আন্দোলনে আমরা জয়ী হলাম। এবার শুরু হল সাংস্কৃতিক আন্দোলন, পাশাপাশি রাজনৈতিক সংগ্রামও। পাকিস্তানের রাজনীতিতে পালাবদল ঘটল। যেটুকু গণতন্ত্র চর্চার চেষ্টা চলছিল, তা ধ্বংস করে সামরিক শাসন এল। বাংলার মানুষ প্রতিবাদী হল। আমাদের শিক্ষাকে ধ্বংস করার চেষ্টা হল। ছাত্রসমাজ রাস্তায় নেমে সে উদ্যোগ ভেস্তে দিল। তারপর মধ্যষাটে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে শুরু হল আমাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের বৃহত্তর সংগ্রাম।

১৯৬৬ থেকে শুরু করে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পর্যন্ত পাকিস্তানের ইতিহাস ছিল শাসকদের শঠতা, নিষ্ঠুরতা এবং অবিমৃশ্যকারিতার। এই শাসকদের মোকাবিলা করে কোনো দাবি আদায় করা ছিল প্রায় অসম্ভব, যেহেতু শাসকদের প্রধান অংশটি ছিল সেনাবাহিনী। কিন্তু বঙ্গবন্ধু সেই অসম্ভবকে সম্ভব করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিল পুরো বাংলাদেশ। আজকের রাজনৈতিকভাবে বিভাজিত, নিরন্তর ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত আত্মঘাতী বাঙালি সমাজের দিকে তাকালে বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়, পঞ্চাশ বছর আগে স্বাধীনতার প্রশ্নে দেশটি একটি পাহাড়ের মতো অবিচল ঐক্য নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই ঐক্য ভাঙার অনেক চেষ্টা পাকিস্তানিরা করেছে – তারা কিছু সুবিধাবাদী রাজনীতিবিদ এবং ধর্মান্ধ একটি গোষ্ঠীকে নানা প্রলোভনে হাত করে নিয়েছিল। কিন্তু মানুষের ঐক্যের সামনে তাতে কোনো কাজ হয়নি। মানুষের ঐক্যে ফাটল ধরানোর অপপ্রয়াস সম্বন্ধে আমরা জানতাম। এবং এ-ও জানতাম যে বঙ্গবন্ধু তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা এবং দূরদর্শিতা দিয়ে অনৈক্যের সব চেষ্টাকেই নস্যাৎ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সম্পর্কে আমরা, অর্থাৎ যারা তখন স্কুল কলেজে পড়তাম, যেটুকু জানতাম, তা কোনো বইপত্র পড়ে নয়, বরং নানা মানুষের কাছ থেকে শুনে।

এঁদের মধ্যে কেউ কেউ তাঁর রাজনৈতিক সহচর ছিলেন, কেউ কেউ ছিলেন অনুসারী। পাকিস্তানের ডন পত্রিকায় বঙ্গবন্ধুর সাহস নিয়ে একটা লেখা লিখেছিলেন এক সাংবাদিক। তাঁকে নিয়ে আলতাফ গওহরের দু-একটি মন্তব্যও তখন মর্নিং নিউজ-এ বেরিয়েছে। আর ১৯৬৬ সালে শুরু করে আগরতলা মামলা থেকে বঙ্গবন্ধুর অব্যাহতি পেয়ে ফিরে আসা পর্যন্ত তিনি অসংখ্য জনসভা করেছেন। সেগুলোর কয়েকটিতে আমরা উপস্থিত থেকেছি। এসব জনসভায় তিনি যখন বক্তৃতা করতেন, মনে হতো, ভয়-ডর কাকে বলে, তিনি তা জানেন না। খুব পরিষ্কার উচ্চারণে তিনি পাকিস্তানি শাসকদের জানিয়ে দিতেন, তাদের অপচেষ্টা বাংলার মানুষ রুখে দেবেই। তাঁর প্রিয় একটি কথা ছিল, 'জেলের ভয় দেখাবেন না।' পাকিস্তানি শাসকেরা প্রায়শ বঙ্গবন্ধুকে জেলে নিয়ে যেত। বাংলাদেশের কোন জেলে তাঁকে নেওয়া হতো, তা-ও আমরা অনেক দিন পর্যন্ত জানতাম না। এক মেয়াদে

জেল খেটে বেরোবার মুখে জেল গেটেই আবার তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে – এ রকম ঘটনাও ঘটেছে। কিন্তু জেলে যাওয়াটা বঙ্গবন্ধুর কাছে স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল, যেন দেশের জন্য, মানুষের জন্য রাজনীতি করছেন, জেলে তো যেতেই হবে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে ছয় দফার আন্দোলন যেমন প্রথম একটা সংগঠিত এবং সুবিন্যস্ত কর্মসূচি নিয়ে অগ্রসর হতে আমাদের দিক নির্দেশনা এবং গতিশীলতা দিল, তেমনি বিশাল অভিঘাত ফেলল আগরতলা মামলা, যা শুধু বঙ্গবন্ধু নয়, গোটা বাঙ্গালি জাতির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র। এরপর এলো উণসত্তরের গণআন্দোলন। তারপর সত্তরের নির্বাচন। এবং সবশেষে একাত্তরের মার্চ।

ঐ মার্চের ৭ তারিখ ঢাকার রেসকোর্স মাঠে বঙ্গবন্ধু ঘোষণা দিলেন, এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম।

তারপর এলো ২৫ মার্চের কালরাত্রি। অসুর শক্তির বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধ শুরু হল।

বাকিটা ইতিহাস।

১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু দেশে ফিরে তাঁর শেষ সংগ্রামটি শুরু করেন এবং সেটি ছিল বাংলাদেশকে 'সোনার বাংলায়' রূপান্তরিত করা। তবে এ সংগ্রামটি ছিল সবচেয়ে কঠিন এবং এতে বিজয় লাভ ছিল খুবই কঠিন। এর কারণ দেশের ভেতর ও বাইরের অসংখ্য প্রতিকূলতা। বাংলাদেশ ছিল যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি দেশ। এর অবকাঠামো ছিল ধ্বংসপ্রাপ্ত। এর অর্থনীতি ছিল অত্যন্ত নাজুক। আন্তর্জাতিকভাবে বাংলাদেশ শীতলযুদ্ধের পরোক্ষ বলি হয়েছিল। সোভিয়েত রাশিয়া বাংলাদেশের মিত্র হওয়ায় যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমা কিছু শক্তি বাংলাদেশকে মিত্র হিসেবে গ্রহণ করেনি। ফলে বড় মাপের আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে উন্নতি সাধন ছিল দেশটির জন্য এক গুরুতর চ্যালেঞ্জ। তাছাড়া দেশের ভেতর – এমনকি বঙ্গবন্ধুর সরকারের ভেতরেও-- ছিল তার বিরুদ্ধচারীরা। এদের সঠিকভাবে চিনতে পারেননি বঙ্গবন্ধু, এমনি ধূর্ত ছিল এই বিশ্বাসঘাতকেরা। বঙ্গবন্ধু যদি আর দশজন রাজনীতিবিদের মতো হতেন, যারা তাঁর মতো উদারচিত্রের এবং ক্ষমাশীল নন, তাহলে হয়তো এদের অনেক আগেই শনাক্ত করতে পারেন। আমাদের আক্ষেপ হয়, বঙ্গবন্ধু যদি আরো শক্ত হাতে এদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেন, মিত্রদের সহযোগিতায় জনগণকে সঙ্গে নিয়ে তাদের নিষ্ক্রিয় করতে পারতেন তাহলে বাইরের প্রতিকূলতা তিনি নিশ্চয় কাটিয়ে উঠতে পারতেন। বঙ্গবন্ধুর বিশ্বাস ছিল সব বাঙালিই মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্দীপ্ত। কিন্তু বাস্তব ছিল ভিন্ন জিনিস। বাস্তবে ছিল চক্রান্তকারীরা, তাকে সরিয়ে ফেলা ছিল যাদের উদ্দেশ্য।

চক্রান্তকারীরা সফল হল কারণ বঙ্গবন্ধু মানুষকে বিশ্বাস করতেন। তিনি নিজের নিরাপত্তা নিয়ে ভাবতেন না। এবং ঘাতকদলের দু'একজন ছিল তাঁর রাজনৈতিক সঙ্গী, তাঁর অনুগ্রহে যারা তাদের অবস্থান পাকা করে নিয়েছিল।

বিশ্বাসঘাতকতার বিষ খুব সহজেই লক্ষ্যে আঘাত করতে পারে।

বঙ্গবন্ধুর চলে যাওয়ার পর সাড়ে চার দশকের বেশি সময় পার হল। আমার মাঝে মাঝে ভেবে অবাক লাগে যে, মানুষটি সারা জীবনের সংগ্রাম, ত্যাগ, তিতিক্ষায় একটি জাতির রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক আর ভৌগোলিক মুক্তি দিয়ে গেলেন, একটি মানচিত্র আর পতাকা দিয়ে গেলেন, তাঁর মৃত্যু এদেশের কেউ কী করে কামনা করে, এবং এমন কাপুরুষের মত বিশাল বাহিনী, ট্যাঙ্ক, কামান-বন্দুক নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে নিদ্রামগ্ন সেই মানুষটি ও তাঁর পরিবারের ওপর? আরো অবাক লাগে, যে মানুষটাকে যুক্তি দিয়ে মোকাবেলা করার সাহস পাকিস্তানিরাও কখনো দেখাতে পারেনি, তাদের একান্ত অনুগত ও সেবক এই বাংলাদেশি হন্তারকগুলিও কখনো সামান্য ছিটেফোঁটা সাহস দেখিয়েও তাঁর সামনে দাঁড়াতে পারেনি। বঙ্গবন্ধু মানুষকে বিশ্বাস করতেন; যাদের জন্য তিনি স্বাধীনতা এনে দিয়েছিলেন, তারা তাঁর অমঙ্গল কামনা করতে পারে, তিনি তা ভাবতে পারেননি। অথচ নির্মম সত্যটি হল, একাত্তরে অনেক বাংলাদেশি স্বাধীনতার অহংকারের পরিবর্তে পরাধীনতার গ্লানিটাকে বেছে নিয়েছিল। নিজের দেশের মানুষকে শত্রুর হাতে তুলে দিয়ে তারা বিকৃত আনন্দ পেয়েছিল। বাংলাদেশের স্বাধীনতা তারা মেনে নেয়নি, তাদের মনে বরং জেগেছিল পরাজিতের অপমান। সেই অপমানের একটা ছবি হয়ে ছিল একাত্তরের বিজয় দিবসের বিকেলে সোহরাওয়ার্দি উদ্যানের মাটিতে অস্ত্র রেখে পাকিস্তানি সেনাপতিদের আত্মসমর্পণ করাটা। এত বেশি অস্ত্র নিয়ে বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে চড়াও হওয়ার একটা কারণ নিশ্চয় ঐ অপমানের মনস্তত্ত্বে লুকিয়ে থাকা অস্ত্র-সমর্পণের ছবিটা।

বঙ্গবন্ধু যে ক'টি বছর সময় পেয়েছিলেন দেশগড়ার জন্য, তাতে কয়েকটি বিষয়ের ওপর জোর দিয়েছিলেন। তাতে ছিল শিক্ষা, কৃষি ও অর্থনীতি।

কৃষির ক্ষেত্রে নজর দেয়ার বিষয়টি তাঁর জন্য ছিল স্বাভাবিক। কারণ তিনি কৃষকের দু:খ বুঝতেন। অনেক পরিশ্রমে তারা ফসল ফলালেও তার মূল্য তাদের হাতে যেত না – জমির মালিক, ফারিয়া দালাল, মধ্যস্বত্বভোগীরা যেসব হাতিয়ে নিত। এজন্য কৃষি ও খাদ্য নিয়ে তাঁর একটা বিশেষ চিন্তা ছিল, যার প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর সময়ে নেয়া নানা পরিকল্পনায়। কৃষকের জন্য সার,

উন্নত বীজ, সেচের পানি, এবং বাজার পর্যন্ত নির্বিঘ্নে ফসল পৌছে দেয়া – এসব বিষয়গুলি গুরুত্ব পেয়েছিল। ১৯৭৪ সালে উত্তরবঙ্গে একটা দুর্ভিক্ষাবস্থা তৈরি হয়েছিল। এটি হয়েছিল আন্তর্জাতিক নানা প্রতিবন্ধকতা ও চক্রান্তের কারণে।

বঙ্গবন্ধু জানতেন, খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা ছাড়া দু:খী মানুষের মুখে হাসি ফুটবে না। সেই সময়ে উন্নত ধান উৎপাদন প্রযুক্তি কিভাবে বিদেশ থেকে আনা যায়, তার আয়োজন তিনি করতে শুরু করেন। আমরা যদি ১৯৭৫ ও ১৯৭৬ এর জিডিপি প্রবৃদ্ধির হিসাবগুলি দেখি, আমাদের নজরে আসবে ১৯৭০ ও ৭১ এর নেতিবাচক প্রবৃদ্ধির বিপরীতে প্রায় ৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন হচ্ছে, এবং তাতে বিশাল অবদান রেখেছে কৃষি।

কিন্তু বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে দেশটাকে পাকিস্তানের অনুগত করার, পাকিস্তানি চিন্তাভাবনা এবং সংস্কৃতি ফিরিয়ে আনার একটা চেষ্টা অবশ্য চলতে থাকে। প্রায় দেড়-দুই দশক ধরে সেটি চলেছে। এ জন্য আমাদের কৃষি দুর্বল হয়েছে। উঠতি কিছু ধনপতি সৃষ্টিও হয়েছে। নানাভাবে তারা টাকার মালিক হয়েছে। কিন্তু কৃষকের, শ্রমিকের ভাগ্যের কোনো উন্নয়ন হয়নি। তবে বাংলাদেশ ১৯৭৫-এর পর যতই পেছনে যাক, যতই এর আদর্শচিন্তা আচ্ছন্ন হোক সাম্প্রদায়িকতায়, সেটি যে দীর্ঘস্থায়ী হবে, তা ভাবার কোনো কারণ নেই। যে জাতি একাত্তরে বিশাল জনযুদ্ধ করেছে, সে আরেকটা যুদ্ধ করতে যে প্রস্তুত, তাও তো অবধারিত ছিল। সেই যুদ্ধে আবারও সামিল হয়েছেন কৃষক-শ্রমিক-তৃণমূল রাজনীতিবিদ-সংস্কৃতিকর্মী ও তরুণেরা। এদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, ছোটবড় উদ্যোক্তা-উদ্ভাবক এবং নানানক্ষেত্রে কর্মরত পেশাজীবীরা। এই যুদ্ধে তাদের অস্ত্র ছিল তাদের স্বাধীনসত্তা, বাংলাদেশের মাটি ও পতাকা নিয়ে তাদের অহংকার, তাদের পরিশ্রম, মেধা, সহনশীলতা, এবং তাদের আত্মবিশ্বাস। এই অস্ত্র পশ্চিমের অস্ত্র ব্যবসায়ীরা যোগান দেয় না, এটি তৈরি হয় বাংলাদেশের সংস্কৃতি-ইতিহাস ও সৃজনচিন্তায়। গত কয়েক দশকের যুদ্ধে আমরা ক্রমাগত এগিয়েছি, একটির পর একটি বাধার দুর্গ জয় করেছি। এখন অর্থনীতি ও উন্নয়নে আমরা দক্ষিণ এশিয়ায় শুধু ভারতের পেছনে আছি, যদিও মানব উন্নয়নের অনেক সূচকে আমরা সবার উপরে।

সভ্য মানুষ এভাবেই যুদ্ধ করে – দারিদ্র্য, অশিক্ষা, অপুষ্টির বিরুদ্ধে, সাংস্কৃতিক নানা আগ্রাসনের বিরুদ্ধে।

এই যুদ্ধেও আমাদের প্রেরণা জুগিয়ে চলছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বাঙ্গালি বীরেরা ১৯৭২-এর শুরুতে একাত্তরের যুদ্ধাস্ত্র জমা দিয়েছিলেন, বঙ্গবন্ধুর কাছেও, কয়েকটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। বঙ্গবন্ধু ধরেই নিয়েছিলেন, যুদ্ধাস্ত্রের প্রয়োজন আর নেই, যেটুকু প্রয়োজন, তা দেশের সুরক্ষার জন্য। এ কারণে অস্ত্রের বর্মের ভেতরে তিনি অবস্থান দেননি – তিনি গণভবনে থেকে যেতে পারতেন, নানান অস্ত্রে সজ্জিত সৈন্য সান্ত্রীর পাহারায়, কিন্তু তিনি বেছে নিয়েছিলেন তাঁর নিজের বাড়িটিকে। এখন সবাই বুঝতে শুরু করেছেন, কোন অস্ত্রটাতে তিনি বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন। ১৯৭২ সালে একটি অসাধারণ সংবিধান তিনি জাতিকে উপহার দিলেন, তাতে যে চার মূলনীতি সংযোজিত হয়েছিল, সেগুলি ছিল সভ্য মানুষের অস্ত্র। ১৯৭৪ সালে তাঁরই উৎসাহে কুদরত-ই-খোদা শিক্ষা কমিশন যে রিপোর্ট তৈরি করে, সেটি ছিল আরেকটি অস্ত্র। এই রিপোর্টটির বাস্তবায়ন শুরু হলে আমরা অনেক দূর এগিয়ে যেতে পারতাম, জীবনের নানা ক্ষেত্রের, বিরূপ বিশ্বে প্রতিযোগিতা করে একটা শক্ত অবস্থানে পৌঁছে যাওয়ার যুদ্ধে আমরা অনেকগুলি বাধা অতিক্রম করে ফেলতে পারতাম।

সেই সম্ভাবনাটা অবশ্য এখনও রয়ে গেছে এবং দেশের সব মানুষ তা উপলব্ধি করছে। এবং সেজন্যও দেশটা তৈরি হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রের মতো কৃষিতে ও খাদ্য উৎপাদনে আমরা আশাতীত উন্নতি করেছি। নতুন প্রজাতির ধান উৎপাদিত হচ্ছে, এক ফসলা জমি তিন ফসলা হচ্ছে, শাক-শব্জির সমারোহ দেখা যাচ্ছে মাঠে মাঠে। ফল চাষের ব্যাপ্তি বেড়েছে। ড্রাগন ফ্রুট বা স্ট্রবেরির মতো ফল, যা এক দশক আগেও ছিল আমাদের অজানা, তাদের বাম্পার ফলন হচ্ছে। এসবই পরিসংখ্যান ও বাস্তব অভিজ্ঞতার বিষয়।

এজন্য ধন্যবাদ প্রাপ্য প্রথমত আমাদের কৃষকদের ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের, এবং পাশাপাশি কৃষি গবেষক ও বিজ্ঞানীদের, কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের মাঠ কর্মীদের। বাংলাদেশকে বাধাহীনভাবে ভবিষ্যতের পথে এগোতে হলে কৃষিতে ঘটানো বিপ্লবকে আরো গতিশীল করতে হবে। তবে খাদ্য উৎপাদনই শেষ কথা নয় – প্রত্যেক নাগরিকের জন্য খাদ্য প্রাপ্তি সহজ করা এবং সাধ্যের ভেতরে আনাটাই সবচেয়ে বেশি প্রয়োজনীয়। এর সঙ্গে যুক্ত হতে হবে খাদ্যকে নিরাপদ করা।

খাদ্য নিরাপত্তার দু'টি দিক আছে। এক হচ্ছে খাদ্যের অভাব থেকে নিজেদের রক্ষা করে সবসময় পর্যাপ্ত খাদ্যপ্রাপ্তি নিশ্চিত করা, এবং যেমন বলা হয়েছে, গরীব মানুষের সাধ্যের ভেতরে নিয়ে আসা, এবং দ্বিতীয় হচ্ছে খাদ্যকে নিরাপদ করা। বঙ্গবন্ধু দু'টি বিষয়কেই সমান গুরুত্ব দিয়েছেন। এখন যদি আমরা এই দুই লক্ষ্যে এগোই – ইতিমধ্যে অনেকদূর অগ্রসরও হয়েছি আমরা – তাহলে বঙ্গবন্ধুর এই স্বপ্নটি সফল হবে। বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ সুন্দর হবে।

এই কাজটি আমাদের প্রধান কর্তব্যও।

মুজিববর্ষ সংখ্যা

BFSA envisioned as the pre-eminent institution for food safety

Sanjay Dave

Former Chairman, Codex Alimentarius Commission

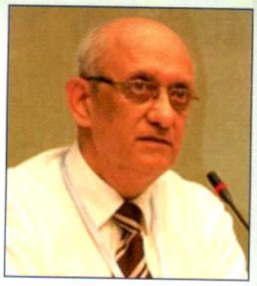

Bangladesh is a founding member of WTO and aims at becoming a developed country by 2041. This calls for certain key decisions to see Bangladesh from the eyes of our Bangabandhu, Sheikh Mujibur Rahman.

It is our collective responsibility to ensure that the citizens remain healthy; exports are enhanced and to ensure that imported food is not sub-standard. This calls for ensuring that our food standards are of international level (Codex), are based on science and do not create unnecessary barriers to trade. It is heartening to note that there is no other Act or institution in Bangladesh than the Food Safety Act implemented by BFSA that has expressly enunciated this in line with the WTO commitments. **T**he Government took a bold decision to promulgate the Food Safety Act and set up a specialized body called BFSA. Where was the need to do this when there has been a national level body regulating food standards developed by it? The answer is simple - in order to have a focused approach towards availability of safe food, to reduce the disease burden on the Govt. and to effectively regulate food products produced and sold in the market.

Under the Food Safety Act, BFSA has been assigned the responsibility of establishing an efficient and effective mechanism for licensing, regulating food production, processing, storage, import and sales to ensure availability of safe food to consumers. Read with Section 13.4, the different sections of the Act make BFSA responsible for ensuring this by aligning the National standards with Codex. How is this possible when BFSA is not involved in Codex work ? Such initiatives are possible through coordination with all concerned departments, scientific and other institutions, universities and the industry. BFSA needs to be empowered to do this. The role of BFSA requires it to take full control of food safety by coordinating its functions across different organizations and departments in order to realize the purpose of setting up an Authority. The term used is **'Authority'**. The overlap across multiple organizations enforcing different laws and standards for food products might need to be corrected as this raises misconceptions about the role of BFSA before other organizations.

To make progress, BFSA has developed an ambitious Five-Year Strategic Plan with technical support from FAO's Meeting the Undernutrition Challenge (MUCH) project, with a 10-year perspective. It is aligned to the 8th Five Year Plan, the National Food Policy, 2006 as well as the National Food and Nutrition Security Policy, 2020. BFSA has also embarked upon a massive exercise of harmonizing National food standards with those of Codex. BFSA has also notified the SPS Enquiry Point for Bangladesh and the Ministry of Commerce may, in turn, notify this to the WTO in line with WTO commitments. Progress on both these initiatives should be closely monitored.

Two high-level policy decisions that can prove to be a game-changer are worth considering:

1. Government may consider adopting the principle of **'ONE NATION, ONE FOOD LAW'**;

2. Recognize BFSA as the pre-eminent institution for food safety in the country by strengthening it not just within Bangladesh but also for leading Bangladesh interests in Codex, INFOSAN and bilateral negotiations on SPS matters.

মুজিববর্ষ সংখ্যা

ট্রান্স ফ্যাটি এসিড : মানব স্বাস্থ্যে ইহার প্রভাব

প্রফেসর ড. মোঃ আব্দুল আলীম

সদস্য, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ

তেল বা চর্বি জাতীয় পদার্থকে একত্রে লিপিড বলা হয়। ইহা একটি ট্রাইগ্লিসারাইড। ইহা তিনটি ফ্যাটি এসিডের সমন্বয়ে গঠিত একটি প্রাকৃতিক অণু। লিপিড পানিতে অদ্রবণীয় কিন্তু হেক্সেন, ক্লোরোফর্ম, এসিটন, বেনজিন ইত্যাদিতে দ্রবণীয়। যে লিপিড সাধারণ তাপমাত্রায় (২৫°সে) তরল থাকে তাকে তেল বলা হয়। যেমন- সরিষার তেল, সয়াবিন তেল, সূর্যমূখী তেল, তিলের তেল ইত্যাদি। যে লিপিড সাধারণ তাপমাত্রায় (২৫° সে) তরল থাকে না তাকে চর্বি বা ফ্যাট বলা হয়। যেমন- ঘি, ডালডা, মাখন, বনস্পতি ঘি ইত্যাদি।

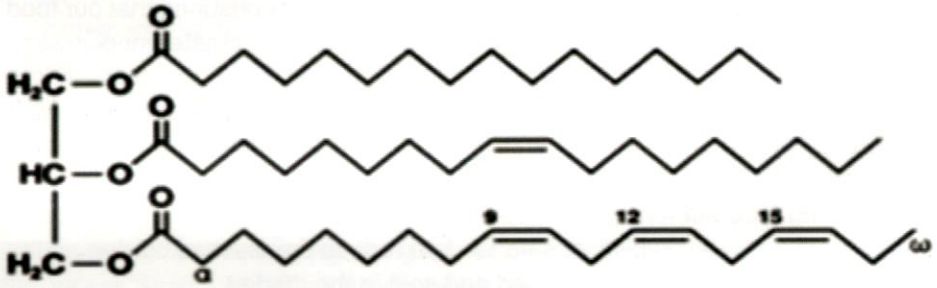

চিত্র ১. ট্রাইগ্লিসারাইড

ফ্যাটি এসিড দুই প্রকার। যথা (১) সম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড - **সম্পৃক্ত** ফ্যাটি এসিডে কোন কার্বন-কার্বন দ্বিবন্ধন থাকে না। চর্বি বা ফ্যাটে **সম্পৃক্ত** ফ্যাটি এসিড বেশি পরিমাণ থাকে। (২) অসম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড - অসম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিডে এক বা একাধিক কার্বন-কার্বন দ্বিবন্ধন থাকে। তেলে অসম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড বেশি পরিমাণ থাকে।

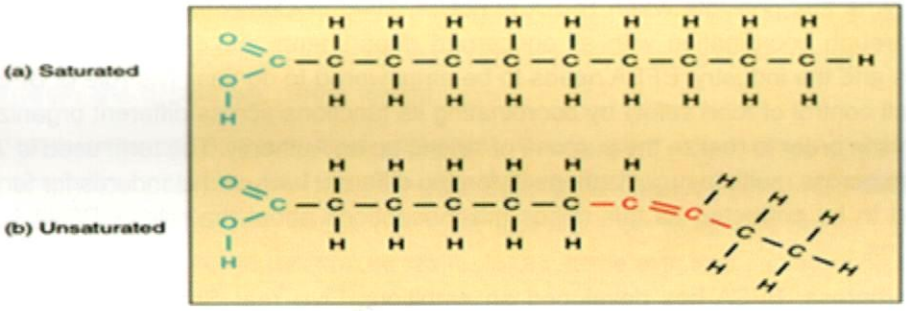

চিত্র ২. সম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড ও অসম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড

ট্রান্স ফ্যাট বা ট্রান্স ফ্যাটি এসিড হলো একটি অসম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড যার কার্বন-কার্বন দ্বিবন্ধন এ হাইড্রোজেন আয়ন সিস *(cis)* কনফিগারেশন-এর পরিবর্তে ট্রান্স *(trans)* কনফিগারেশনে থাকে। অর্থাৎ হাইড্রোজেন আয়ন একই পাশে থাকার পরিবর্তে বিপরীতমূখী থাকে।

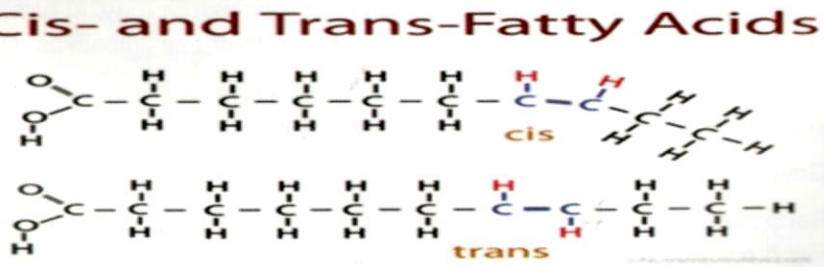

চিত্র ৩. সিস *(cis)* এবং ট্রান্স *(trans)* কনফিগারেশন

ট্রান্স ফ্যাট বা ট্রান্স ফ্যাটি অ্যাসিডের উৎস মূলত দুইটি। (১) প্রাকৃতিক - যে সকল প্রাণী জাবর কাটে অর্থাৎ রুমিনেন্ট এনিম্যাল (Ruminant Animal) সেই সব গবাদি-পশুর অন্ত্রে এটি প্রাকৃতিক ভাবে তৈরি হয়, যার ফলে গরু-ছাগলের মাংস, দুধ এবং দুগ্ধজাত খাবার যেমন ঘি, মাখন ইত্যাদি স্বল্প মাত্রায় ট্রান্স ফ্যাট পাওয়া যায়, যা মানব স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর নয়। (২) কৃত্রিম - আংশিক জারিত তেল (Partially Hydrogenated Oils) অর্থাৎ ভেজিটেবল অয়েল বা উদ্ভিজ্জ তেলের (পাম, সয়াবিন উত্যাদি) সাথে হাইড্রোজেনেশান পদ্ধতির মাধ্যমে হাইড্রোজেন যুক্ত করলে তেল জমে যায় এবং ট্রান্স ফ্যাট উৎপন্ন হয়। এই আংশিক হাইড্রোজেনেশন তেলই (PHO) শিল্পোৎপাদিত ট্রান্স ফ্যাটের প্রধান উৎস, যা ডালডা বা বনস্পতি ঘি নামেও পরিচিত। এতে ২৫-৪৫ শতাংশ পর্যন্ত ট্রান্স ফ্যাট থাকে। খাদ্য প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানগুলো খাবার সংরক্ষণের সুবিধার্থে এবং বিভিন্ন ভাজা-পোড়া এবং বেকারি খাদ্যপণ্যের স্বাদ, ঘ্রাণ এবং স্থায়ীত্ব বাড়ানোর জন্য আংশিক হাইড্রোজেনেটেড তেল ব্যবহার করে থাকে। এছাড়া ভাজা-পোড়া খাদ্যে একই ভোজ্য তেল উচ্চ তাপমাত্রায় বারবার ব্যবহারের কারণেও খাদ্যে ট্রান্সফ্যাট সৃষ্টি হয়। সাধারণত: খরচ কমানোর জন্য হোটেল-রেস্তোরাঁয় সিঙ্গারা, সমুচা, পুরি, জিলাপি, চিকেন ফ্রাইসহ বিভিন্ন ধরনের ভাজা-পোড়া খাবার তৈরির সময় একই তেল ব্যবহার করা হয়। এ কারণে এসব খাবারে ট্রান্সফ্যাটের পরিমাণ বেড়ে যায়।

শিল্পোৎপাদিত ট্রান্স ফ্যাট বা Industrially-Produced Trans Fatty Acids (ITFA) মানব দেহের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। উচ্চ মাত্রায় ট্রান্স ফ্যাট গ্রহণ হার্ট অ্যাটাকসহ হৃদরোগজনিত মৃত্যু ঝুঁকি বৃদ্ধি করে । WHO এর হিসেব অনুযায়ী, বিশ্বে প্রতি বছর এক কোটি ৭৯ লক্ষ মানুষ হৃদরোগে মৃত্যুবরণ করে, যার মধ্যে প্রায় সাড়ে পাঁচ লক্ষ মানুষ শিল্পোৎপাদিত ট্রান্স ফ্যাট গ্রহণের কারণে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে হৃদরোগজনিত অসুস্থতা ও মৃত্যু এতোটাই দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে যে, জনস্বাস্থ্য বিশেজ্ঞরা একে প্যানডেমিক বা বিশ্বব্যাপী অতিমারি বলে আখ্যা দিয়েছেন। বাংলাদেশেও প্রতিবছর ২ লক্ষ ৭৭ হাজার মানুষ হৃদরোগে মারা যায়, যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। এ অবস্থা চলতে থাকলে ২০৩০ সালের মধ্যে অসংক্রামক রোগজনিত অকাল মৃত্যু এক তৃতীয়াংশে কমিয়ে আনা সংক্রান্ত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ্য ৩.৪) অর্জন কার্যত অসম্ভব হয়ে পড়বে। সুতরাং হৃদরোগ প্রতিরোধসহ জনস্বাস্থ্যের কার্যকর উন্নয়নের জন্য ট্রান্স ফ্যাট নির্মূলের কোন বিকল্প নেই।

ট্রান্স ফ্যাটযুক্ত খাবার রক্তে খারাপ কোলেস্টেরল হিসেবে পরিচিত Low Density Lipoprotein বা এলডিএল (LDL) কোলেস্টেরল বৃদ্ধি করে, অপরদিকে High Density Lipoprotein বা এইচডিএল (HDL) কোলেস্টেরল (যাকে ভালো কোলেস্টেরল বলা হয়) কমিয়ে দেয়। এইচডিএল কোলেস্টেরল রক্তনালী থেকে খারাপ কোলেস্টেরল সরিয়ে দেয়। কিন্তু ট্রান্স ফ্যাটের কারণে এইচডিএল কমে যায় এবং খারাপ কোলেস্টেরল রক্তবাহী ধমনিতে জমা হয়ে রক্তচলাচলে বাধা সৃষ্টি করে। এভাবে হৃদরোগের ঝুঁকি বেড়ে যায়। এছাড়াও ট্রান্স ফ্যাটযুক্ত খাবারের কারণে স্ট্রোক এবং টাইপ-২ ডায়াবেটিস এ আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিও বৃদ্ধি পায়। উচ্চমাত্রায় ট্রান্স ফ্যাট গ্রহণের কারণে সার্বিকভাবে মৃত্যুঝুঁকি ৩৪ শতাংশ পর্যন্ত বেড়ে যায়। এছাড়াও হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি ২১ শতাংশ এবং হৃদরোগজনিত মৃত্যুঝুঁকি ২৮ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। ২০০৬ সালে ইংল্যান্ড জার্নাল অফ মেডিসিনে প্রকাশিত ট্রান্স ফ্যাটি অ্যাসিড ও হৃদরোগ নিয়ে এক গবেষণায় বলা হয়েছে, ক্যালারিভিত্তিক পরিমাপে খাবারের মধ্যে অন্য যেকোন কিছুর তুলনায় ট্রান্স ফ্যাটের কারণে হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি, এমনকি অতি স্বল্পমাত্রায় গ্রহণও (মোট খাদ্যশক্তির মাত্র ১-৩ শতাংশ) মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকি সৃষ্টি করে থাকে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরামর্শ অনুযায়ী, একজন ব্যক্তির দৈনিক ট্রান্স ফ্যাট গ্রহণের পরিমাণ হওয়া উচিত মোট খাদ্যশক্তির ১ শতাংশের কম, অর্থাৎ দৈনিক ২০০০ কিলোক্যালোরির ডায়েট তা হতে হবে ২.২ গ্রামের চেয়েও কম।

বাংলাদেশে হৃদরোগজনিত মৃত্যু এবং অসুস্থতার চিত্র অত্যন্ত উদ্বেগজনক। আংশিক হাইড্রোজেনেটেড অয়েল বা PHO এর অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার এবং খাদ্যের মাধ্যমে উচ্চ মাত্রায় ট্রান্সফ্যাট গ্রহণ অসংক্রামক রোগের মৃত্যুঝুঁকি বহুগুণ বাড়িয়ে তুলছে। এক্ষেত্রে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার REPLACE অ্যাকশন প্যাকেজ অনুসরণ করে নিম্নলিখিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা হলে হৃদরোগজনিত অসুস্থতা ও মৃত্যু কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় হ্রাস পাবে এবং যা একই সাথে ২০৩০ সালের মধ্যে অসংক্রামক রোগজনিত অকাল মৃত্যু এক-তৃতীয়াংশে কমিয়ে আনার মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ৩.৪ অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

- বেশি করে অল্প তেল সমৃদ্ধ ডেইরি প্রোডাক্টস, পোল্ট্রি, ফিস, নাট, ফলমূল, শাকসবজি ও হোল গ্রেইন খাওয়া জরুরি।
- ডোনাট, কুকিজ, ক্রেকার্স, মাফিন্স, পিস কেক, পেস্ট্রি, চিকেন ফ্রাই, পিজ্জা, ফ্রেন্স ফ্রাই ইত্যাদি ট্রান্স ফ্যাট সমৃদ্ধ খাবার কম খেতে হবে।
- শিল্পোৎপাদিত ট্রান্সফ্যাটে পরিবর্তে স্বাস্থ্যসম্মত তেল/ চর্বির ব্যবহার উৎসাহিত করা।
- শিল্পোৎপাদিত ট্রান্সফ্যাট নির্মূল করতে আইন প্রণয়ন করা। এ ক্ষেত্রে খাদ্যের শিল্পোৎপাদিত ট্রান্সফ্যাটের সর্বোচ্চ মাত্রা ২ শতাংশের নিচে নির্ধারণসহ আংশিক হাইড্রোজেনেটেড অয়েল বা PHO এর উৎপাদন, আমদানি, বাজারজাতকরণ এবং ব্যবহার নিষিদ্ধ করা।
- ট্রান্সফ্যাট এবং আংশিক হাইড্রোজেনেটেড অয়েল বা PHO এর স্বাস্থ্য ক্ষতি সম্পর্কে নীতি-নির্ধারক, উৎপাদক, সরবরাহকারী এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করা।

মুজিববর্ষ সংখ্যা

খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিট (এফপিএমইউ) এর পরিচিতি

মোঃ শহীদুজ্জামান ফারুকী
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
এফপিএমইউ

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অন্যতম কাজ হল দেশের নির্ভরযোগ্য খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা (Establishment of Dependable National Food Security System) এবং সার্বিক খাদ্য ব্যবস্থার গাইডলাইন প্রণয়ন করা। দেশের সামগ্রিক খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে বিভিন্ন নীতি, কৌশল, কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, গবেষণা পরিচালনা, নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে সরকারকে বিভিন্ন পলিসি সার্পোট প্রদান করা সহ বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী, জাতিসংঘসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা ও বিভিন্ন আঞ্চলিক সংস্থার সাথে collaboration ও সার্বিক সমন্বয়ের ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিট (এফপিএমইউ) কাজ করে আসছে। এফপিএমইউ কর্তৃক নিয়মিতভাবে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাজারে খাদ্যশস্যের (চাল ও গম) উৎপাদন, সরবরাহ, চাহিদা, মজুদ তথা সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা, খাদ্য নিরাপত্তা ও খাদ্য সম্পর্কীয় অন্যান্য বিষয়াদির তথ্যাদি ও বিশ্লেষণমূলক দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ (Monitoring) প্রতিবেদনসহ চাহিদা ও বাস্তবতার নিরিখে বিভিন্ন সময়ে গবেষণা এবং জনকল্যাণমূলক খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি বিষয়ক নির্দেশিকা/পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়। দৈনিক প্রতিবেদনে খাদ্যশস্য পরিস্থিতি, সরকারি অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ পরিস্থিতি এবং সরকারি বিতরণ এর একটি চিত্র থাকে। সাপ্তাহিক প্রতিবেদনের মাধ্যমে দৈনিক প্রতিবেদনে উল্লিখিত তথ্যসমূহের এক সপ্তাহের তূলনামূলক চিত্র বা পরিবর্তন তুলে ধরা হয়। পাক্ষিক প্রতিবেদন (Fortnightly Food Grain Outlook)-এ মূলতঃ বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক বাজারে চাল ও গমের মূল্যের পাক্ষিক পরিবর্তন, Trade prospect ও খাদ্য পরিস্থিতির হালনাগাদ তথ্য উপাত্ত প্রকাশ করা হয়। ত্রৈমাসিক বাংলাদেশ খাদ্যশস্য পরিস্থিতি প্রতিবেদন (Bangladesh Food Situation Report) এ বছর জুড়ে বাংলাদেশের খাদ্য পরিস্থিতির বিবরণসহ আন্তর্জাতিক খাদ্য পরিস্থিতির বিশ্লেষণ ও পূর্বাভাস প্রদান করা হয়ে থাকে। জাতীয় খাদ্য নীতি, ২০০৬, Food composition table for Bangladesh, জাতীয় খাদ্য গ্রহণ নির্দেশিকা, জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি ২০২০ প্রণয়নে এফপিএমইউ কার্যকরী ভূমিকা পালন করেছে। এছাড়া, নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩ প্রণয়নে কারিগরি পলিসি সাপোর্ট প্রদানে এফপিএমইউ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি ২০২০ এর কর্মপরিকল্পনা সঠিকভাবে বাস্তবায়ন, ক্ষুধা ও অপুষ্টি মোকাবেলাসহ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) ও প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (Perspective Plan; 2021-2041) অর্জন, সামগ্রিক খাদ্য ব্যবস্থাকে পুষ্টি-সংবেদনশীল করা জন্য সংশ্লিষ্ট আন্তঃখাতীয় কর্মপদ্ধতির সাথে সমন্বয় করে নীতি কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, খাদ্য পরিকল্পনা (সংগ্রহ,আমদানি ও দেশে খাদ্য চাহিদা নিরুপন, Food Gap analysis, খাদ্য ভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন) এবং Sustainable Food Systems Approach এর সফল বাস্তবায়নের জন্য জাতিসংঘসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা ও বিভিন্ন আঞ্চলিক সংস্থার সাথে collaboration ও সার্বিক সমন্বয়ের জন্য খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিট (এফপিএমইউ) বিভিন্ন কাযক্রম পরিচালনা করে আসছে। সকল নাগরিকের জন্য নির্ভরযোগ্য ও টেকসই খাদ্য নিরাপত্তা, নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্যের পর্যাপ্ত ও নিয়মিত সরবরাহ, বর্ধিত ক্রয় ক্ষমতা ও খাদ্য গ্রহণের সক্ষমতা এবং নারী ও শিশুদের পর্যাপ্ত পুষ্টির নিশ্চয়তাকে বিবেচনা করে এফপিএমইউ কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা খাতে রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা ২০১১-২০১৫ (সিআইপি-১) প্রণয়ন করেছে। রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা (সিআইপি) হলো বিভিন্ন খাতওয়ারি তহবিল সঞ্চালনের মাধ্যমে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা। জাতীয় খাদ্যনীতির সামগ্রীক উদ্দেশ্যকে অভিন্ন রেখে সমগ্র খাদ্য ব্যবস্থাকে বিবেচনা করে খাদ্যের সকল উপাদান (পরিবেশ, মানুষ, উপকরণ প্রক্রিয়া, অবকাঠামো, প্রতিষ্ঠান, বিপণন ও বাণিজ্য) এবং উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, বিতরণ ও ভোগের সাথে সম্পর্কিত সকল আর্থসামাজিক ও পরিবেশগত ফলাফল সহ যাবতীয় কাজের ফলাফল অন্তর্ভূক্ত করে ক্ষুধা ও অপুষ্টি মোকাবেলাসহ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন(এসডিজি) ও সামগ্রিক খাদ্য ব্যবস্থাকে পুষ্টি-সংবেদনশীল করা জন্য সংশ্লিষ্ট আন্তঃখাতীয় কর্মপদ্ধতির সাথে সমন্বয় করে বিনিয়োগ কর্মসূচি বাস্তবায়নকে লক্ষ্য রেখে দ্বিতীয় রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা ২০১৬-২০২০ (সিআইপি-২) প্রণয়ন করা হয়েছে। জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি, ২০২০ এর বাস্তবায়নের বিনিয়োগ কর্মপরিকল্পনার ক্ষেত্রে খাদ্য ও পুষ্টির নিরাপত্তার বিভিন্ন Dimension অর্জনের জন্য Food Systems Approach কে বিবেচনা করে তৃতীয় রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা (সিআইপি-৩) প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে।

দেশের সামগ্রিক খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তার অবস্থা সম্পর্কিত রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা এবং জাতীয় খাদ্যনীতির কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সম্পর্কিত মনিটরিং রিপোর্ট খাদ্য মন্ত্রণালয়ের খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিট (এফপিএমইউ) ২০১২ সাল থেকে প্রতি বছর নিয়মিত প্রকাশ করছে।

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিট (এফপিএমইউ) সার্বিক সহযোগিতা খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি তৈরি, পরিকল্পনা ও প্রয়োগ ইত্যাদি কাজে জড়িত বিভিন্ন কমিটি রয়েছে যেমন, থিমেটিক টিম (টিটি), Food Policy Working Group (FPWG), National Committee, খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ কমিটি (এফপিএমসি), ইত্যাদি। এফপিএমইউ প্রাথমিকভাবে থিমেটিক টিমের সভা এবং অনানুষ্ঠানিক সমন্বয়ের মাধ্যমে আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় এবং তথ্য উপাত্ত বিনিময় শক্তিশালী করার কাজে নিযুক্ত থাকে। Food Policy Working Group টি হচ্ছে মূলত একটি সুপাভাইজরি কমিটি যা থিমেটিক টিমের কার্যক্রম সঠিকভাবে পর্যবেক্ষণ করে থাকে এবং National Committee সাধারণত Food Policy Working Group এর কার্যক্রমকে যাচাই করে।

দেশের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা সম্পর্কিত সরকারকে পরামর্শ প্রদানের জন্য খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ কমিটি (এফপিএমসি) কে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করে খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিট (এফপিএমইউ)। মাননীয় খাদ্য মন্ত্রীর সভাপতিত্বে এফপিএমসি সভা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে; যেখানে আরও ৭ জন মাননীয় মন্ত্রী রয়েছেন এবং ১০ জন সম্মানিত সচিব রয়েছেন। মূলত এফপিএমসি হল খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তার Apex Body of Governance. এছাড়া, এফপিএমইউ খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি বিষয়ে বহুমুখী (multi-sectoral) নীতি পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে তার অবস্থানকে অনেক শক্তিশালী করেছে। এর মধ্যে রয়েছে সমন্বয়, পরিবীক্ষণ এবং নীতি প্রণয়ন বিষয়ক সহায়তা কার্যক্রম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তামূলক গভর্নেন্স প্রক্রিয়াসমূহ, যেমন: বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, জাতীয় পুষ্টি কার্যক্রম বাস্তবায়নে জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটির গঠন ইত্যাদি কার্যক্রমে এফপিএমইউ নিয়মিতভাবে নিয়োজিত রয়েছে। এছাড়াও এফপিএমইউ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) লক্ষ্যমাত্রা বিশেষ করে এসডিজি'র লক্ষ্য-২ "ক্ষুধা দূরীকরণ খাদ্য নিরাপত্তা এবং উন্নত পুষ্টি অর্জন এবং টেকসই কৃষি উন্নয়ন" এর কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে জড়িত আছে।

Food System Approach এর সুবিধাসমূহ ব্যবহার করে জলবায়ু পরিবর্তন এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক সমস্যা মোকাবেলা করে ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে UN Food System Summit ২০২১ এর জন্য সম্প্রতি National Pathway Document প্রণয়নে এফপিএমইউ মূখ্য ভূমিকা পালন করেছে।

পুষ্টি বিষয়ে জাতীয় পর্যায়ে কিশোর-কিশোরী এবং তরুণ-তরুণীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, তাদের পুষ্টি বিষয়ক জ্ঞান বৃদ্ধি এবং নেটওয়ার্ক তৈরি ও প্রসারিত করার উদ্দেশ্যে ২০১৭ সাল থেকে এফপিএসইউ এর টেকনিক্যাল সহায়তায় নিউট্রিশন অলিম্পিয়াডের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। যা জাতীয় ও বৈশ্বিক পর্যায়ের কিশোরী ও তরুণদের নেতৃত্বে সকলে খাদ্য নিরাপত্তা এবং পুষ্টিমান উন্নয়নে উৎসাহিত করছে। সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ রূপকল্প বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে তথ্যাদি সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও আদান-প্রদানের উন্নততর তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে। খাদ্য নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের মধ্যে ইন্টারনেটভিত্তিক তথ্য আদান-প্রদানের লক্ষ্যে খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি সংক্রান্ত ইনফরমেশন সিস্টেম (Food Security and Nutrition Information System) এফপিএমইউ Maintain করছে। এই ইনফরমেশন সিস্টেম এর মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে খাদ্য অধিদপ্তর এর তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ (এমআইএসএন্ডএম), কৃষি বিপণন অধিদপ্তর এবং অন্যান্য সংস্থার এর মধ্যে তথ্য আদান প্রদানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিট (FPMU) এর ওয়েবসাইটে www.mofood.gov.bd/ www.fpmu.gov.bd) হালনাগাদ ডাটাবেইজ সকলের জন্য (Publicly) উন্মুক্ত করা হয়েছে।

মুজিববর্ষ সংখ্যা

স্থিরচিত্রে নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের কর্মযজ্ঞ

শান্তির প্রতীক পায়রা উড়িয়ে জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস-এর শুভ উদ্বোধন করলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

৪র্থ জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত সিইও (CEO) সম্মেলনে অতিথিদের বিশেষ সম্মাননা প্রদান করেন জনাব সাধন চন্দ্র মজুমদার, এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, খাদ্য মন্ত্রণালয়

নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ বাস্তবায়নে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর ভূমিকা শীর্ষক মতবিনিময় সভায় বাংলাদেশ পুলিশের সম্মানিত আইজিপি জনাব বেনজীর আহমেদ, বিপিএম ও বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সম্মানিত চেয়ারম্যান জনাব মো: আব্দুল কাইউম সরকার

নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ ও বিধি-প্রবিধি সম্পর্কে অবহিতকরণ এবং জনসচেতনতা সৃষ্টিতে গণমাধ্যম শীর্ষক সেমিনারে বক্তব্য প্রদান করছেন জনাব সাধন চন্দ্র মজুমদার, এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, খাদ্য মন্ত্রণালয়

মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ আয়োজিত নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক পথনাটক পরিবেশন করছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নাট্য সংসদ

মুজিববর্ষে কোভিড-১৯ এর স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে ক্যারাভান রোড শো'তে নিরাপদ খাদ্য অফিসার কর্তৃক জনসাধারণের মাঝে লিফলেট বিতরণ

মুজিববর্ষ সংখ্যা

স্থিরচিত্রে নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের কর্মযজ্ঞ

মুজিববর্ষে ত্রিশাল উপজেলায় খাদ্য প্রতিষ্ঠানে Safe Food Plan বাস্তবায়ন মনিটরিং করছেন বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আব্দুল কাইউম সরকার ও কর্তৃপক্ষের সদস্য প্রফেসর ড. আব্দুল আলীম

মুজিববর্ষে হোটেল/রেস্তোরাঁ মূল্যায়নের ভিত্তিতে গ্রেডিং প্রদান করছেন বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সম্মানিত চেয়ারম্যান জনাব মো: আব্দুল কাইউম সরকার

বস্তি ও পিছিয়ে পড়া এলাকায় অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের সমন্বয়ে নিরাপদ খাদ্য ও পুষ্টিবিষয়ক জনসচেতনতামূলক কর্মসূচি বাস্তবায়নের প্রাক্কালে

মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে প্রান্তিক পর্যায়ে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে আয়োজিত গৃহিণীদের সাথে জনসচেতনতামূলক উঠান বৈঠক

অনিরাপদ ও ঝুঁকিপূর্ণ খাদ্য শনাক্তকরণ ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে রাজধানীর একটি কাঁচা বাজার থেকে পরীক্ষণের জন্য নমুনা সংগ্রহ করা হচ্ছে।

মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে কোভিড-১৯ এর স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক জনসচেতনতামূলক সেমিনার

সংবাদপত্রে নিরাপদ খাদ্য

খাদ্যে ভেজাল রোধে কঠোর হওয়ার নির্দেশনা প্রধানমন্ত্রীর

bangla.bdnews24.com/bangladesh/article1860614.bdnews

নিজস্ব প্রতিবেদক, বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম

Published: 18 Feb 2021 02:06 PM BdST Updated: 18 Feb 2021 05:57 PM BdST

খাদ্যে ভেজালের বিরুদ্ধে সচেতনতা সৃষ্টির পাশাপাশি যারা এ কাজ করছেন, তাদের কঠোর হাতে দমনের নির্দেশনা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

সব স্তরে খাদ্য নিরাপদে ১০ বিধি-প্রবিধি কার্যকর

প্রকাশ : ০৯ নভেম্বর ২০২১, ১৭:০২ | অনলাইন সংস্করণ

নিজস্ব প্রতিবেদক

দেশের সব স্তরে খাদ্য নিরাপদ করতে এখন পর্যন্ত দশটি বিধি-প্রবিধিমালা করেছে বাংলাদে নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ।

বর্তমানে কার্যকর দশটি বিধি-প্রবিধিমালা হচ্ছে- নিরাপদ খাদ্য (খাদ্যদ্রব্য জব্দকরণ ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ পদ্ধতি) বিধিমালা, ২০১৪; খাদ্য সংযোজন দ্রব্য ব্যবহার প্রবিধানমাল ... ক্ষতিকর অবশিষ্টাংশ প্রবিধানমালা, ২০১৭; মোড়কাবদ্ধ খা... দ্যর নমুনা সংগ্রহ, পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ প্রবিধানমালা, ... বিধিমালা, ২০১৭; নিরাপদ খাদ্য (স্বাস্থ্যসম্মত ...

নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতে প্রতি বিভাগে খাদ্য ল্যাবরেটরি

Jagonews24.com

নিজস্ব প্রতিবেদক

প্রকাশিত: ০৫:০৯ পিএম, ০৯ নভেম্বর ২০২১

খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার বলেছেন, দেশে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতে সেন্ট্রালি একটি ল্যাব নারায়ণগঞ্জে করা হচ্ছে। যা হবে দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে সর্ববৃহৎ। এছাড়া প্রতিটি বিভাগে আটটি ল্যাব এবং একটি করে ভ্রাম্যমাণ ল্যাব করা হচ্ছে। যেগুলো বিভাগের যেকোনো এলাকায় খাদ্য গ্রহণ করে তা পরীক্ষা করতে পারবে।

মঙ্গলবার (৯ নভেম্বর) ঢাকায় হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল গ্রান্ড বলরুমে

বাংলা ট্রিবিউন

পাউরুটিতে ক্ষতিকর পটাশিয়াম ব্রোমেট, অভিযানে নামবে বিএফএসএ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট

০৭ সেপ্টেম্বর ২০২১, ২০:৩৬

কালের কণ্ঠ

নির্ধারিত সময়ে বন্ধ খোলা ভোজ্য তেল

নিজস্ব প্রতিবেদক ৮ ডিসেম্বর, ২০২১ ০০:০০ | পড়া যাবে ৫ মিনিটে

নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের গবেষণা

- বোতলজাত তেলের ১৩ ও খোলায় ৪৭ শতাংশে ভিটামিন 'এ' নেই
- খোলা বাজারজাত করা হয় ৬৫ শতাংশ, পেট বোতলে হয় ৩৫%
- প্রতি কেজিতে ভিটামিন 'এ' যোগ করতে খরচ মাত্র ১২ পয়সা

নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করবে ট্রান্সফ্যাট নিয়ন্ত্রণ প্রবিধান

নিজস্ব প্রতিবেদক | ২ ডিসেম্বর, ২০২১ ০০:০০

দেশ রূপান্তর

খাদ্যদ্রব্যে ক্ষতিকর ট্রান্স ফ্যাটি এসিড নিয়ন্ত্রণে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) নীতি গ্রহণ করেছে সরকারের নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ। গত সোমবার 'খাদ্যদ্রব্যে ট্রান্স ফ্যাটি এসিড নিয়ন্ত্রণ প্রবিধানমালা-২০২১' গেজেট আকারে প্রকাশ করেছে সংস্থাটি।

সরকারের এ উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছে প্রগতির জন্য জ্ঞান (প্রজ্ঞা), ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন অব বাংলাদেশ এবং কনজুমারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব)।

মুজিববর্ষ সংখ্যা

সংবাদপত্রে নিরাপদ খাদ্য

Sadhan emphasizes training for food workers, housewives

AA Correspondent

AA Correspondent

Food Minister Sadhan Chandra Majumder laid emphasis on bringing all the food workers, housewives and those who involved in the food chain under training to ensure food safety.

The food minister made the remark while speaking as the chief guest at a workshop titled "Project information and releasing strategic plans of Bangladesh Food Safety

প্রথম আলো

বাংলাদেশ

ভেজাল রোধে হবে খাবারের পরীক্ষাগার : প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ফাইল ছবি

খাদ্যে ভেজাল রোধে দেশে বিশেষায়িত পরীক্ষাগার করা হবে বলে ঘোষণা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। আজ রোববার রাজধানীতে জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস উপলক্ষে নিরাপদ খাদ্য মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এই ঘোষণা দেন প্রধানমন্ত্রী। রাজধানী ঢাকার কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশনে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

FE The Financial Express

BFSA adopts policy to limit transfat in food

FE REPORT | Thursday, 2 December 2021

The Bangladesh Food Safety Authority has adopted the best-practice policy under a World Health Organisation (WHO) guideline in regulating toxic TFA or trans fatty acids in foodstuffs.

As per policy, the level of trans fat would be limited aiming to meet the target of fixing its maximum level to 2.0 per cent of the total fat in all oils, fats and foodstuffs by December 31, 2022.

The regulation has been issued through a gazette, dated November 29, 2021.

Jagonews24.com EN

নিরাপদ খাদ্য নিয়ে জনসচেতনতায় ক্যারাভান রোড শো

জেলা প্রতিনিধি | নরসিংদী | প্রকাশিত: ০৩:১০ পিএম, ১৪ নভেম্বর ২০২০

'জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় নিরাপদ ও পরিচ্ছন্ন খাদ্য গ্রহণ করুন।' কোভিড-১৯ ও মুজিববর্ষ উপলক্ষে এই স্লোগানকে সামনে রেখে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে খাদ্য নিরাপত্তা শীর্ষক ক্যারাভান রোড শো ও

নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের মোবাইল কোর্ট পরিচালনা

ঢাকার কামরাঙ্গিরচর এলাকায় মেসার্স আয়েশা-আসমা ফুড প্রোডাক্টস এন্ড সাপ্লায়ারসে মোবাইল কোর্ট করা হয়।

মঙ্গলবার (২১ সেপ্টেম্বর) বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট জনাব শাহ মো নেতৃত্বে এই অভিযান পরিচালিত হয়।

অভিযানকালে বিএসটিআইয়ের কোন লাইসেন্স পাওয়া যায়নি এবং প্রতিষ্ঠানের ব্যান্ড উৎপাদনের

নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের মনিটরিং

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজধানীর বাদামতলিতে দেশের অন্যতম বৃহত্তম পাইকারি ফলের বাজারে (আড়ৎ) বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের আজকের মনিটরিং কার্যক্রম।কার্যক্রম পরিচালনা করেন,বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের মনিটরিং অফিসার মোহাম্মদ ইমরান হোসেন মোল্লা,মনিটরিং অফিসার মোঃ আমিনল ইসলাম ও নিরাপদ খাদ্য অফিসার (ঢাকা

মুজিববর্ষ সংখ্যা

নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ বাস্তবায়নে প্রণীত বিধি-বিধানসমূহ :

বিধিসমূহ ঃ

১. নিরাপদ খাদ্য (খাদ্যদ্রব্য জব্দকরণ ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ পদ্ধতি) বিধিমালা -২০১৪;
২. নিরাপদ খাদ্য (কারিগরি কমিটি)বিধিমালা, ২০১৭;
৩. বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ আর্থিক বিধিমালা, ২০১৯;

প্রবিধিসমূহ ঃ

১. নিরাপদ খাদ্য (মোড়কাবদ্ধ খাদ্য লেবেলিং) প্রবিধানমালা, ২০১৭;
২. নিরাপদ খাদ্য (রাসায়নিক দূষক, টক্সিন ও ক্ষতিকর অবশিষ্টাংশ) প্রবিধানমালা, ২০১৭;
৩. খাদ্য-সংযোজন দ্রব্য ব্যবহার প্রবিধানমালা, ২০১৭;
৪. খাদ্যের নমুনা সংগ্রহ, পরীক্ষা এবং বিশ্লেষণ প্রবিধানমালা, ২০১৭;
৫. নিরাপদ খাদ্য (স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ সংরক্ষণ) প্রবিধানমালা, ২০১৮;
৬. বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা, ২০১৮;
৭. নিরাপদ খাদ্য (খাদ্য স্পর্শক) প্রবিধানমালা, ২০১৯;
৮. নিরাপদ খাদ্য (খাদ্য ব্যবসায়ীদের বাধ্যবাধকতা) প্রবিধানমালা-২০২০;
৯. নিরাপদ খাদ্য (খাদ্য প্রত্যাহার প্রবিধানমালা)-২০২০;
১০. নিরাপদ খাদ্য (দূষণকারী জীবাণু নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ) প্রবিধানমালা, ২০২১; এবং
১১. ট্রান্স ফ্যাটি এসিড নিয়ন্ত্রণ প্রবিধানমালা' ২০২১